শব্দের সীমানা …

কথাশিল্পী সেলিনা হোসেনের সাক্ষাৎকার

‘আমার এক হাতে ব্যক্তিগত জীবন, অন্য হাতে লেখালেখি’

সাক্ষাৎকার গ্রহণে **মারুফ রায়হান**

বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে সেলিনা হোসেন সুপরিচিত একটি নাম। একটানা লিখে যাওয়ার নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের উজ্জ্বল উদাহরণও যেন তিনি। চার দশক ধরে লিখছেন, প্রধানত গল্প-উপন্যাস; যদিও লিখেছেন কিশোর সাহিত্য, প্রবন্ধগ্রন্থ এবং সম্পৃক্ত থেকেছেন নানামুখী সম্পাদনায়। সব মিলিয়ে গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় অর্ধশত। তাঁর জন্ম ১৯৪৭ সালে রাজশাহী শহরে। পৈতৃক নিবাস লক্ষ্মীপুর জেলার হাজিরপাড়া গ্রাম। তাঁর আলোচিত কয়েকটি উপন্যাস হলো : হাঙর নদী গ্রেনেড, পোকামাকড়ের ঘরবসতি, গায়ত্রী সন্ধ্যা, লারা, ঘুমকাতুরে ঈশ্বর। ‘যাপিত জীবন’ উপন্যাসটি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ‘নিরন্তর ঘন্টাধ্বনি’ উপন্যাসটি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশ পত্রে পাঠ্য। আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর-এ তিনটি উপন্যাস পাঠ্য।

ইংরেজি, হিন্দি, মারাঠি, কানাড়ি, মালয়ালাম, রুশ, মালে, ফরাসি, উর্দু প্রভৃতি ভাষায় তাঁর বেশ কয়েকটি গল্প অনূদিত হয়েছে। ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে তিনটি উপন্যাস ‘হাঙর নদী গ্রেনেড’, ‘নীল ময়ূরের যৌবন’ ও ‘টানাপড়েন’। পেয়েছেন দেশের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পুরস্কার। ৩৪ বছর বাংলা একাডেমীর সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন চাকরিসূত্রে; সম্প্রতি অবসরে গেছেন। ফলে আরো বেশি সময় দিতে পারছেন লেখালেখিতে। জেন্ডার গ্রন্থমালা সম্পাদনার কাজে নিয়োজিত আছেন কয়েক বছর ধরে। ভ্রমণ তাঁর নেশা। সময় ও সুযোগ পেলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এবং দেশের বাইরে বেরিয়ে পড়েন। অনেক দেশ ভ্রমণ করেছেন। যদিও এখনো পর্যন্ত হাত দেননি ভ্রমণসাহিত্য রচনায়। সাপ্তাহিক ২০০০কে দেয়া তাঁর এই সাক্ষাৎকার থেকে লেখক সেলিনা হোসেনের চিন্তাজগৎ সম্পর্কে পাঠক আরো সরাসরি জানতে পারবেন। তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির নেপথ্য ভুবন এবং জীবনের অকথিত অধ্যায়ের খানিকটা চিত্রও পাওয়া যাবে এতে। সম্ভবত এর আগে সেলিনা হোসেনকে এমন তাৎপর্যপূর্ণভাবে পাওয়া যায়নি আর কোনো আলাপচারিতায়।

সাপ্তাহিক ২০০০ : বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে আপনার গল্প লেখার সূচনা নাকি চাকরির প্রয়োজনে? কোন চাকরি?

সেলিনা হোসেন : যেকোনো চাকরি, চাকরি মানে জীবিকা। আর গল্প লেখার সূচনা কিন্তু চাকরির প্রয়োজনে নয়। গল্প তো আমি লিখতে শুরু করি ভেতরকার তাগাদা ও নিজস্ব প্রেরণা থেকে। বলতে পারেন, গল্পগ্রন্থ প্রকাশের সূচনা আমার জীবিকার প্রয়োজনে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে বেরুনোর পর আমার শিক্ষক অধ্যাপক আব্দুল হাফিজ বললেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ে যে কয়টি গল্প লিখেছো সেগুলো দিয়ে বই বের করো, বাবার কাছ থেকে টাকা আনো। তোমার বায়োডাটায় এটি একটি অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে সংযোজিত হবে। সুতরাং লেখক হবার বাসনা থেকে বই করবো- এমন সংকল্প আমার ছিল না।

লেখালেখির সূচনা আমার কলেজ জীবনেই, কবিতা দিয়ে। ঢাকায় পাঠাতাম সেসব কবিতা। কখনো ছাপা হতো, কখনো হতো না। পরে আমার মনে হয়েছিল আমার একটা বড় ক্যানভাস দরকার; যে ক্যানভ্যাসে আমি অনেক কথা বলতে পারবো। আমার শৈশব-কৈশোর হচ্ছে সোনালি সময়ের শৈশব কৈশোর; যেখানে আমার দুই ধরনের অভিজ্ঞতা ছিল। এক, অবাধ প্রকৃতি দেখা; মাঠ-ঘাট প্রান্তর, খাল-বিল, নদী, ধানক্ষেত, আকাশ- ঘুরে বেড়ানোর অবাধ স্বাধীনতা ছিল। বগুড়া জেলার সেই করতোয়া নদীর তীরে বাবার চাকরিসূত্রেই থাকতে হয়েছিল। আব্বা মাছ ধরতেন, শিকার করতেন। কচুরিপানা মাথায় দিয়ে বন্দুক কাঁধে বাবা এগুতেন বিলের মধ্যে, আমি তাঁর পেছনে পেছনে যেতাম। বাবার সর্বক্ষণিক সঙ্গী হিসেবে আমার অভিজ্ঞতার জগৎ তৈরি হয়েছিল। প্রকৃতি দেখেছি দু’চোখ ভ’রে। আর দ্বিতীয়ত দেখেছি মানব-মানবীর সম্পর্ক। মানুষের সঙ্গে মানুষের আচরণ যে কতো বিচিত্র হতে পারে সেটা শৈশব-কৈশোরে দেখতে পেয়ে সম্পর্কের জটিলতার ব্যাপারে জ্ঞাত হয়েছিলাম। মানবসমাজের কথা, মনস্তাত্ত্বিক বিষয়, সম্পর্কের জটিলতার কথা, প্রকৃতির বিবিধ কথা- এসব প্রকাশের জন্য বড় ক্যানভাসের প্রয়োজন অনুধাবন করেছিলাম। সে জন্যেই কথাসাহিত্য চর্চা।

২০০০ : আপনার প্রথম গল্পগ্রন্থ ‘উৎস থেকে নিরন্তর’ সত্যি সত্যিই কি জীবিকা অর্জনে সহায়ক হয়েছিল?

সেলিনা হোসেন : হ্যাঁ হয়েছিল। আমার সেই শিক্ষক অনেককেই আমার বই দিয়েছিলেন। মুনীর চৌধুরীর কাছেও একটি

কপি ছিল, তিনি টেলিভিশনে বইটির আলোচনা করেছিলেন। পাবলিক সার্ভিস কমিশনে কলেজের চাকরির ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে দেখলাম যে বোর্ডে স্বয়ং মুনীর চৌধুরী উপস্থিত। সেই প্রথম তাঁকে সামনাসামনি দেখা, তাঁর দেখা পাওয়ার কী প্রবল ইচ্ছাই না আমার ছিল, অথচ দেখা হলো কি না চাকরির ইন্টারভিউ বোর্ডে! আমার চাকরি হয়ে গেল। সিলেট এমসি কলেজের প্রভাষক পদে যে আমাকে নিয়োগ দেয়া হলো তার নেপথ্যে আমার ওই গল্পগ্রন্থটির ভূমিকা রয়েছে বলে আমি মনে করি। একই বছর বাংলা একাডেমীর গবেষণা সহকারী হিসেবে ইন্টারভিউ দিই। বোর্ডে উপস্থিত ছিলেন ড. মুহম্মদ এনামুল হক। যাঁকে বাঘের মতো ভয় পেতাম। বোর্ডে আরো ছিলেন নীলিমা ইব্রাহিম, আবদুল্লাহ আল মুতী শরফুদ্দীন ও কবীর চৌধুরী। আমার বিশ্বাস, এবারেও চাকরিপ্রাপ্তির সহায়ক হিসেবেই কাজ করেছিল উনসত্তরে প্রকাশিত ওই গল্পগ্রন্থটি।

লারার আমেরিকান বন্ধু এমি, ওর বাবা মার্টিনের সঙ্গে লারা, মুনা, শমিক, আনোয়ার হোসেন খান ও সেলিনা হোসেন ১৯৯৮

'সত্তরের জলোচ্ছ্বাসের পর আমি উপন্যাস রচনার কথা ভাবি। আমার শ্বশুরবাড়ি পটুয়াখালীতে ছিলাম সে সময়ে। জলোচ্ছ্বাসকবলিত এলাকাগুলোতে আমি ব্যাপকভাবে ঘুরেছি, দেখেছি। তখন মনে হয়েছিল যে, জলোচ্ছ্বাস-পরবর্তী মানুষের জীবন নিয়ে একটি উপন্যাস লেখা যেতে পারে। চাক্ষুস অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছিল 'জলোচ্ছ্বাস' উপন্যাসটির কাহিনী'

২০০০ : সে সময়ে কথাসাহিত্যে আপনার আদর্শ কে ছিলেন? কার কার লেখা পড়তেন গুরুত্ব দিয়ে?

সেলিনা হোসেন : সে সময়ে সবচেয়ে বেশি পড়তাম মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প; একটি গল্প কয়েকবার করে পড়তাম। কখনো কখনো মনে হতো এই লেখাগুলোই আমার আদর্শস্থানীয় হতে পারে যেগুলোকে আমার চিন্তার ক্ষেত্র হিসেবে আমি অনুসরণ করতে পারি।

২০০০ : ষাটের দশক ছিল উত্তাল, আন্দোলন দানা বাঁধছে। অন্যদিকে কিছু কিছু সাহিত্য সংগঠন বা লেখকগোষ্ঠী তৈরি হচ্ছে। আপনার অবস্থাটা কী ছিল?

সেলিনা হোসেন : রাজশাহী থেকে ১৯৬৯ সালে অজানা-অচেনা বন্ধুহীন আত্মীয়স্বজনহীন শহরে ঢাকায় এসে একা একাই ঘুরতাম। এমন কেউ ছিলেন না যাঁর কাছে গিয়ে আমি দু'দন্ড বসতে পারি, কথা বলতে পারি বা কোনো পরামর্শ নিতে পারি। কাজেই আমার অবস্থাটা কী ছিল বুঝতেই পারছেন। কারো সঙ্গেই আমার কোনো যোগাযোগ ছিল না। আমি নিজের সঙ্গে নিজেই লড়াই করেছি। পরে বাংলা একাডেমী চাকরিসূত্রেই আস্তে আস্তে আমার পরিচিতিটা হয়েছে। বিশেষ করে বাংলা একাডেমীতে সে সময় যাঁদের পেয়েছি তাঁরা হলেন সরদার ফজলুল করিম, আবু জাফর শামসুদ্দীন, ড. আব্দুল কাইয়ুম। একই সময়ে একাডেমীতে আসতেন রণেশ দাশগুপ্ত ও সত্যেন সেন। এই দু'জন মানুষ আমার চিন্তার ক্ষেত্রকে অনেকখানি বদলে দিয়েছেন।

২০০০ : যাঁদের কথা বললেন এঁরা সবাই আপনার সিনিয়র, অগ্রজতুল্য লেখক। আপনার সমসাময়িক সতীর্থ লেখকদের কথা কিছু বলুন। বিশেষ করে যাঁরা আপনার সাহিত্যের বান্ধব হয়ে উঠেছিলেন সে সময়ে।

সেলিনা হোসেন : হুমায়ুন আজাদ ও আমি একই বছর পাস করে বের হই ভিন্ন ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ওঁর স্ত্রী লতিফা কোহিনূরের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল তাঁর বাংলা একাডেমীতে কিছু কাজের সূত্র ধরেই। 'উৎস থেকে নিরন্তর' বইটির সমালোচনা হুমায়ুন আজাদও লিখেছিলেন। বাংলা একাডেমীর গবেষক হুমায়ুন কবীর আমার কাছে প্রায়ই আসতেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি আমার কাছ থেকে চাঁদাও নিতেন যোদ্ধাদের সহযোগিতা করার জন্য। সত্তরের জুলাইয়ে আমি বাংলা একাডেমীর চাকরিতে যোগ দিই, পরের বছরের শুরুর দিকেই তো যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। ফলে যাঁদের কথা বললাম এঁরা ছাড়া আর তেমন কোনো লেখকের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে ওঠেনি। যুদ্ধের পর আহমদ ছফার সঙ্গে পরিচয় হয়। তারপরে ধীরে ধীরে আরো অনেকের সঙ্গেই হয়েছে।

২০০০ : মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস আপনি কোথায় ছিলেন?

সেলিনা হোসেন : ঢাকাতেই ছিলাম।

২০০০ : চাকরি করতেন?

সেলিনা হোসেন : বাংলা একাডেমীতে যাওয়া-আসা করতাম আর কি।

২০০০ : একাত্তরের স্মৃতি থেকে যদি কিছু বলেন।

সেলিনা হোসেন : ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনেছিলাম রেসকোর্স ময়দানে গিয়ে। সে সময় সায়েন্স ল্যাবরেটরির কোয়ার্টারে থাকতাম। হেঁটেই গিয়েছিলাম রেসকোর্সে। এত জনস্রোত, এত ঢল ছিল যে রিকশা নেবার মতো অবস্থা ছিল না। ওখানে মেয়েদের বসবার জন্য আলাদা ব্যবস্থা ছিল। সেখানে সুফিয়া কামাল ছিলেন। পঁচিশে মার্চ রাতেই প্রচন্ড শব্দে যুদ্ধের তান্ডব অনুভব করেছিলাম। দু'দিন পর কার্ফ্যু ভাঙলে বেরিয়ে পড়ি। প্রথমে নিউমার্কেটে গেলাম, দেখলাম একজন মানুষ তরকারির ঝুড়ির ওপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে, তার গা চাদর দিয়ে ঢাকা। আরো অনেক লাশ দেখলাম সেখানে। ইকবাল হলে গেলাম খুব অসচেতনভাবেই। চাপ চাপ রক্ত সিঁড়িতে। ছাদে উঠে দেখলাম পানির ট্যাঙ্কের কাছে একজন মধ্যবয়সী লোক দুই হাত দু'দিকে ছড়িয়ে শুয়ে আছে, তার দু'পাশে দুটি ৮-৯ বছর বয়সী শিশু। প্রত্যেকেই মৃত। গেটের কাছে এসে দেখি শহীদুল্লাহ কায়সার। তিনি চিৎকার করে বললেন, যান ঘরে যান, কী জন্যে বেরিয়েছেন? তিনি বিদেশী সাংবাদিকদের নিয়ে একটি গাড়িতে করে বেরিয়েছিলেন শহরের অবস্থা দেখার জন্য।

২০০০ : ওই নয় মাসে লেখক হিসেবে কোনো প্রতিবাদ, কিংবা ব্যক্তি হিসেবে কোনো ভূমিকা রাখা সম্ভব হয়েছিল আপনার পক্ষে?

সেলিনা হোসেন : তেমন কিছু না। পুরনো কাপড় দেবার জন্য আহ্বান এলে কাপড় দিলাম। আগেই বলেছি, হুমায়ুন কবীর এসে আমার কাছ থেকে চাঁদা নিয়ে যেতেন। কখনো এমন কিছু করিনি যা মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে যায়।

২০০০ : সে সময় আপনি ছিলেন একজন তরুণ লেখক। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে কী লিখেছিলেন?

সেলিনা হোসেন : কিছুই লিখিনি, এক লাইনও লিখতে পারিনি।

২০০০ : ডায়েরিও না?

সেলিনা হোসেন : না।

২০০০ : ছোটগল্প থেকে আপনি উপন্যাসে কেন এবং কীভাবে যুক্ত হলেন?

সেলিনা হোসেন : সত্তরের জলোচ্ছ্বাসের পর আমি উপন্যাস রচনার কথা ভাবি। আমার শ্বশুরবাড়ি পটুয়াখালীতে ছিলাম সে সময়ে। জলোচ্ছ্বাসকবলিত এলাকাগুলোতে আমি ব্যাপকভাবে ঘুরেছি, দেখেছি। তখন মনে হয়েছিল যে, জলোচ্ছ্বাস-পরবর্তী মানুষের জীবন নিয়ে একটি উপন্যাস লেখা যেতে পারে। চাক্ষুস অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছিল 'জলোচ্ছ্বাস' উপন্যাসটির কাহিনী।

২০০০ : প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে আপনি লিখেছিলেন আপনার প্রথম

উপন্যাস। সাধারণত আপনি উপন্যাস লেখেন কীভাবে? এর জন্যে স্টাডি করেন? এলাকা ভ্রমণ করেন? প্রক্রিয়াটা কী?

সেলিনা হোসেন : আমি একটা বিষয় বা ঘটনাকে ছক করে প্রথমে মাথায় রাখি। সেটা যদি সামাজিক বা মনস্তাত্ত্বিক বিষয় হয় তাহলে তো লিখেই ফেলতে পারি। কিন্তু যদি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে সমকালীন করে উপস্থাপন করতে চাই তাহলে তার জন্য প্রস্তুতি লাগে, পড়াশোনা লাগে। যেমন চর্যাপদের পটভূমিতে লেখা আমার উপন্যাস 'নীল ময়ূরের যৌবন'-এর জন্যে আমাকে প্রচুর পড়তে হয়েছে। চর্যাপদের কবি কাহ্নপাদকে নায়ক করে লেখা সেই উপন্যাস, যে রাজতন্ত্রের সঙ্গে লড়াই করছে। রাজা বলছে তার প্রশস্তি গেয়ে কবিতা লিখতে। কাহ্নপাদ অস্বীকৃতি জানিয়ে বলছে, আমি জনমানুষের কবি। এই দ্রোহের কারণে রাজা সেই কবির হাত কেটে ফেলেন। উপন্যাসে আমি দেখিয়েছি যে কবি কাহ্নপাদ একটি স্বাধীন ভূখন্ডের স্বপ্ন দেখছে; সেই ভূখন্ডটি যেন আজকের এই বাংলাদেশ। ক্ষুব্ধ রাজার গ্রাম পুড়িয়ে দেবার ঘটনাটিও প্রতীকী, মনে পড়ে যাবে একাত্তরে বাংলাদেশের ওপর পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর বর্বর অত্যাচারের কথা। ইতিহাস থেকে আমি উপকরণ গ্রহণ করি, কিন্তু তার পরিসমাপ্তি ঘটে সমসাময়িক পটভূমিতে। আমি বলি যে, আমার এ জাতীয় উপন্যাস শুধু ঐতিহাসিক নয়, এগুলো ঐতিহ্যের নবায়নও।

'১৯৯২ সাল থেকে একটি উপন্যাসের কাজ করছি। সেটা হলো এ দেশে শিলাইদহ, শাহজাদপুর, পতিসরে রবীন্দ্রনাথ যতোটুকু সময় ছিলেন তার প্রেক্ষাপটে একটি উপন্যাস। এ জন্যে প্রচুর তথ্য আমি সংগ্রহ করেছি। কিন্তু লিখতে পারছি না। মনে হচ্ছে সময় হয়নি বা আমি প্রস্তুত নই'

২০০০ : আপনার একটি উপন্যাস লিখতে সাধারণত কী রকম সময় লাগে?

সেলিনা হোসেন : 'গায়ত্রী সন্ধ্যা'- '৪৭ থেকে '৭৫ সাল পর্যন্ত তার কালবিস্তার- তিন খন্ডে লেখা- রাজনৈতিক-অর্থনেতিক-সামাজিক পটভূমিতে বাঙালির আত্মপরিচয়ের অন্বেষণ এই বইটি। সুতরাং আমার চেষ্টা ছিল দশ বছরের । তবে একটানা লিখে যাওয়া সম্ভব হয়নি।

২০০০ : ওই দশ বছরের ভেতর কি অন্য কোনো উপন্যাস রচনায় হাত দেননি?

সেলিনা হোসেন : তথ্য অন্বেষণ ও পাঠের সময়ে পাশাপাশি অন্য উপন্যাসের কাজও করেছি। আমি একই সঙ্গে তিন-চারটি থিম মাথায় রাখি। একসঙ্গে তো আর দুটো উপন্যাস লেখা যায় না; একটিই লিখি। ১৯৯২ সাল থেকে একটি উপন্যাসের কাজ করছি। সেটা হলো এ দেশে শিলাইদহ, শাহজাদপুর, পতিসরে রবীন্দ্রনাথ যতোটুকু সময় ছিলেন তার প্রেক্ষাপটে একটি উপন্যাস। এ জন্যে প্রচুর তথ্য আমি সংগ্রহ করেছি। কিন্তু লিখতে পারছি না। মনে হচ্ছে সময় হয়নি বা আমি প্রস্তুত নই।

২০০০ : কমপক্ষে কত সময় নিয়েছেন একটি উপন্যাস লিখতে?

সেলিনা হোসেন : দুই বছরের কমে তো হয় না।

২০০০ : এই যে প্রতি বছরই একাধিক উপন্যাস বেরুতে দেখছি।

সেলিনা হোসেন : এগুলো সব ছক করা থাকে, দীর্ঘ সময় নিয়ে একটু একটু করে এগোয়। এই যে রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক যে-উপন্যাসটির কথা আপনাকে বললাম সেটা যদি আগামী বছর বেরোয় তো আপনার মনে হতে পারে যে এক বছরেই উপন্যাসটি লিখেছি।

২০০০ : তাহলে একসঙ্গে চার-পাঁচটি উপন্যাসের থিম আপনার মাথায় থাকে?

সেলিনা হোসেন : চারটি উপন্যাস তো থাকেই। যেমন আমার সর্বশেষ উপন্যাস 'ঘুমকাতুরে ঈশ্বর' লেখার সময় এবং তারও আগে আমার পরিকল্পনা ছিল যে মর্গ নিয়ে একটি উপন্যাস লিখবো। আমার ক্যারেক্টার হবে মর্গ। এখানে লাশের আসা-যাওয়া এবং ডোমদের কাজ ও অনুভব, সেই সঙ্গে অন্যান্য চরিত্র থাকবে। লেখাটি আধাআধি হয়ে আছে, শেষ করতে পারিনি। এবার হয়তো ধরবো।

২০০০ : ডোমদের একাত্তরের স্মৃতিকথা পড়লে অবরুদ্ধ সময়ের বীভৎস চিত্র পাওয়া যায়।

সেলিনা হোসেন : হ্যাঁ, এর চেয়ে প্রামাণ্য দলিল আর কী হতে পারে যে দেশে একটি গণহত্যা হয়েছিল। নারীদের ওপর বিচিত্র উপায়ে নির্যাতন চালানো হয়েছিল।

২০০০ : নিভৃতে কখনো কি ভেবেছেন যে আপনি যা লিখে চলেছেন দেশের বৃহত্তর সাধারণ মানুষের কাছে তার কার্যকারিতা কতখানি?

সেলিনা হোসেন : হ্যাঁ ভাবি, প্রচুর ভাবি। সময়-সময় মনে হয় সবটাই আবর্জনায় নিক্ষিপ্ত হবে। আবার বিপরীত চিত্রও দেখি বাস্তবে। যেমন সেদিন পঞ্চগড় থেকে একজন কলেজছাত্রীর চিঠি পেয়েছি। সে আমার বেশ কয়েকটি উপন্যাসের নাম উল্লেখ করে বলেছে যে সেগুলো সে পড়েছে। এখন 'ঘুমকাতুরে ঈশ্বর' উপন্যাসটি কিনবার মতো সামর্থ্য নেই, তাই আমার কাছে বইটি চেয়েছে। একবার গ্রামে গিয়ে ক্লাস নাইনের একটি মেয়ের দেখা পেলাম। সে জানালো 'দীপান্বিতা' তার খুব ভালো লেগেছে। আকস্মিকভাবে এসব প্রাপ্তি যখন ঘটে তখন খুব ভালো লাগে। মনে আছে, আটাশিতে যখন মস্কোতে গেলাম তখন বাংলাদেশের একজন ছাত্র বলেছিলেন যে, 'নিরন্তর ঘন্টাধ্বনি' আপনার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বই। আরেকজন হয়তো বইটিকে তুচ্ছ করে দেখবে। সাহিত্যে তো শেষ বিচার বলে কিছু নেই।

২০০০ : আপনি পাঠকের কথা বললেন, শিক্ষিত শ্রেণীর কথা বললেন। আমি সমগ্র গণমানুষের কথা বলছিলাম। তাদের কাছে আপনার সাহিত্যের কার্যকারিতা কতখানি- এই ভাবনা মনে আসে কি না।

সেলিনা হোসেন : ওদের কাছে তো সাহিত্য পৌঁছায়ই না।

২০০০ : যদিও ওদের নিয়ে এবং ওদের জন্যেও আপনার লেখা রয়েছে?

সেলিনা হোসেন : হ্যাঁ, পাঠক যদি আমার সেই লেখাটাকে গ্রহণ করে ওদের জন্যে কিছু করে সেটাই হবে আমার জন্য সবচেয়ে বড় পাওয়া। তৃণমূল পর্যায়ের মানুষগুলো বই পড়ে পরিবর্তন আনবে না। নিজের অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়েই সে পরিবর্তনের কথা ভাববে। কিন্তু নীতিনির্ধারকগণ যদি সচেতনভাবে ইতিবাচক ও জীবনবাদী কিছু গ্রহণ করতে চায় তাহলে তারা সেটা নিতে পারবে।

২০০০ : হাসান আজিজুল হক একবার আমাকে সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, আমাদের এখানে কথাসাহিত্য শক্ত, দৃঢ়, বজ্রের মতো বাঁধুনির ঘাটতি আছে। কথাসাহিত্যের ধারাটি রুগ্‌ণ। আপনার কী মত?

সেলিনা হোসেন : হাসান ভাই এখন পর্যন্ত উপন্যাস লেখেননি, গল্পেই সীমিত আছেন। আমি জানি না এখন পর্যন্ত কেন তিনি উপন্যাসে এলেন না এবং কথাসাহিত্য তাঁর কাছে রুগ্‌ণ মনে হচ্ছে। আমি এ কথা মানতে রাজি না যে, আমাদের কথাসাহিত্য রুগ্‌ণ;

এখানে অনেক ধরনের কাজ হচ্ছে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা হচ্ছে। হাসান ভাই নিজেও সে ক্ষেত্রে একজন বিস্ময়কর লেখক। পঞ্চাশের দশক থেকেই আমাদের বিষয়, ভাষা এবং প্রকাশ পদ্ধতির ভেতর দিয়েই আমরা একটি পৃথক ধারার সৃষ্টি করতে পেরেছি পশ্চিমবঙ্গের কথাসাহিত্য থেকে।

২০০০ : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ এবং শওকত ওসমান- এ দু'জনের পরে আপনার বিবেচনায় আমাদের সবচাইতে শক্তিশালী তিনজন কথাশিল্পীর নাম বলুন।

সেলিনা হোসেন : হাসান আজিজুল হক, শওকত আলী এবং আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। হাসান ভাই শুরু থেকেই একটি ব্যতিক্রমধর্মী গল্পধারার সূচনা করেছিলেন। পঞ্চাশে রচিত কথাসাহিত্য থেকে তিনি বিষয়ে, ভাষায় এবং আঙ্গিকে ছোটগল্পকে ভিন্ন করে আনেন। তাঁর রচনা আমাদের কথাসাহিত্যের ধারায় একটি সংযোজন। চিন্তার দিক দিয়ে একটু ভিন্নধর্মী ছিলেন শওকত আলী। হাসান আজিজুল যেমন রাঢ় অঞ্চলের জীবনকে প্রতিফলিত করেছেন, শওকত আলী সাধারণ গণমানুষকে এনেছেন, এবং একইসঙ্গে আদিবাসীদের জীবন তুলে এনেছেন। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ঢাকাইয়া কুট্টিদের, গ্রাম ও শহরের সাধারণ মানুষের জীবনকে প্রতিফলিত করেছেন সাহিত্যে যা ভিন্ন মেজাজের এবং স্বাতন্ত্র্যের দাবিদার। তিনজনই ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভঙ্গিতে আমাদের কথাসাহিত্যকে সবল ও শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা করেছেন যা আমাদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। সৈয়দ শামসুল হকের কথাও বিশেষভাবে বলতে চাই। তাঁর গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক এবং অন্যান্য গদ্য রচনা নিয়ে তিনি নিঃসন্দেহে বড়মাপের লেখক। বাংলাভাষী অন্য অঞ্চল থেকে আমাদের সাহিত্য অবশ্যই ভিন্ন মাত্রা অর্জন করেছে।

২০০০ : আপনি কি একথা মানবেন যে, বক্তব্যপ্রধান করে তুলতে গিয়ে অনেক লেখকই তাঁদের লেখাকে শিল্পগুণমানহীন আড়ষ্ট করে ফেলেন?

সেলিনা হোসেন : লেখায় বক্তব্য থাকবে, কিন্তু তাকে আড়ষ্ট করে ফেলার পক্ষপাতী আমি নই। পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করার ক্ষমতা থাকতে হবে একটি লেখার। বক্তব্য যাই থাকুক, সেটা যেন প্রধান হয়ে না ওঠে, শিল্প যেন মার না খায় সেটাই দেখার বিষয়। বক্তব্যকে অবশ্যই শিল্পের মোড়কে আসতে হবে।

২০০০ : কবিতা বা কথাশিল্প- সৃজনশীল সাহিত্য মূল্যায়ন, বিশ্লেষণ এবং সমালোচনার প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের সমালোচনা সাহিত্যের ঘাটতি আছে। আপনার কী মত?

'সমালোচনা সাহিত্য একদমই নেই। ধারাটি গড়েই ওঠেনি। এখন পর্যন্ত যা দেখতে পাচ্ছি, ধারাটি গড়ে ওঠার কোনো প্রচেষ্টাও নেই। এমন একজন সমালোচকও তৈরি হননি যিনি এই বিষয় নিয়েই আছেন, যিনি প্রকাশিত সাহিত্য থেকে নতুন কোনো আলো বের করে দেখাতে চেষ্টা করছেন'

সেলিনা হোসেন : সমালোচনা সাহিত্য একদমই নেই। ধারাটি গড়েই ওঠেনি। এখন পর্যন্ত যা দেখতে পাচ্ছি, ধারাটি গড়ে ওঠার কোনো প্রচেষ্টাও নেই। এমন একজন সমালোচকও তৈরি হননি যিনি এই বিষয় নিয়েই আছেন, যিনি প্রকাশিত সাহিত্য থেকে নতুন কোনো আলো বের করে দেখাতে চেষ্টা করছেন। বহু বছর পরে বাখতিন দস্তয়েভস্কিকে নতুন করে মূল্যায়ন করলেন 'একের ভেতরে বহু কণ্ঠস্বর' বলে; জীবনানন্দ দাশ যেমন জীবদ্দশায় কিছু পাননি, এখন যতো দিন যাচ্ছে তিনি ততো বেশি পাঠকপ্রিয় হয়ে উঠছেন। আমার মনে হয় সমসাময়িককালে সমালোচকের জন্য কাজটা একটু কঠিন। অনেক সময় আমরা ঠিক শক্ত মানুষ হতে পারি না, চেনা মুখ ও প্রীতির সম্পর্কের জন্য আমরা কঠিন কাজটি করার দায়িত্ব নিই না।

২০০০ : একটা ধারণা খুবই চালু যে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বড়মাপের কথাসাহিত্য রচিত হয়নি এখনো আমাদের দেশে। আপনি কি একমত?

সেলিনা হোসেন : আমি দ্বিমত পোষণ করি এ কারণে যে মুক্তিযুদ্ধের পর ৩২ বছর কেটে গেলেও বিষয়টি এখনো সাহিত্যের জন্য সমসাময়িক উপাদান। যাঁরা জীবিত আছেন, মুক্তিযুদ্ধকে কাছ থেকে দেখেছেন এবং যারা তরুণ প্রজন্ম, জন্ম যাদের একাত্তরের পরে, তাঁরা অনবরত বিষয়টি সম্পর্কে জানছেন। এ সবের ভেতর দিয়ে তাঁরা যেটুকুই লিখছেন সেটাই সাহিত্যের সময়ের পরিধির বড় উপাদান। লেখক তাঁর সৃজনশীলতাকে সে উপাদানে সমৃদ্ধ করেন- সেখানে বড়মাপ ছোটমাপ বলে কথা নেই। যা রচিত তা যদি নির্দিষ্ট মানে উন্নীত হয় তা সময়ের বড় রচনাই। তাকে অবমূল্যায়ন করার কোনো যুক্তি নেই। এখন পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে যা লেখা হয়েছে সেটা একটা পর্যায়। পঞ্চাশ বা একশ' বছর পরে কোনো নতুন লেখক এসে ইতিহাস ঘেঁটে তাকে আধুনিকায়ন করে ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে মূল্যায়ন করে যদি লেখেন তাহলে সেটা হবে আরেকটি পর্যায়। ইতিহাসের উপাদানকে বড়মাপ ছোট মাপ বলে চিহ্নিত করা সাহিত্যের ধর্ম নয়। তা শিল্পসম্মত জীবনের সত্য কি না তা দেখাই জরুরি।

২০০০ : উপভাষা ব্যবহারে দক্ষতা দেখাতে পারেন খুব কম লেখকই। উপভাষা ব্যবহারে একটি চরিত্র অনেক বেশি জীবন্ত, প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে পারে। এই উপভাষা ব্যবহারকে ব্যাকরণগ্রাহ্য করার প্রয়োজন আছে কি?

সেলিনা হোসেন : আমি মনে করি তার প্রয়োজন নেই। একটি স্থানিক পটভূমি নিয়ে উপন্যাস রচিত হলে অবশ্যই সেই স্থানের উপভাষাটি আনতে হবে। টেকনাফের পটভূমিতে আমি যখন 'পোকামাকড়ের ঘরবসতি' উপন্যাসটি লিখি তখন আমার পক্ষে চট্টগ্রামের ভাষা আয়ত্ত করা সম্ভব ছিল না। তাই উপন্যাসের সংলাপগুলো আমি আমার অফিসে চট্টগ্রামের সহকর্মীদের কাছ থেকে অনুবাদ করিয়ে নিয়েছিলাম। একইভাবে সিলেটের পটভূমিতে লেখা একটি গল্প একজন সিলেটিকে দিয়ে দেখিয়ে নিয়েছিলাম। এভাবে কাজ করাকে আমি খুব গৌণ কাজ বলে মনে করি না। কারণ সাহিত্যের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার জন্যেই তো আমার এই চেষ্টা। তবে মুখের কথায় ব্যাকরণের বাড়াবাড়ি গ্রহণযোগ্য নয়।

২০০০ : কোনো বিশেষ অঞ্চলের ভাষা ব্যবহার করলে এই বোধগম্যহীনতার কারণে সাহিত্যে সীমাবদ্ধতা এসে যায় কিনা।

সেলিনা হোসেন : আসলে বর্ণনার ভেতরেই অনেক কিছু পাওয়া যায়, তাই ছোট ছোট আঞ্চলিক সংলাপ না বুঝলেও বড় সমস্যা হয় না।

২০০০ : তার মানে উপভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে লেখককে কৌশলী হতে হবে যাতে করে সংলাপ না বুঝলেও পুরো ঘটনা ও আবহ অনুধাবনে কোনো অসুবিধা না হয়?

সেলিনা হোসেন : হ্যাঁ, তা তো অবশ্যই।

২০০০ : আঙ্গিকের বদল কি জরুরি একজন কথাশিল্পীর জন্যে? আপনি নিজে

আঙ্গিকের পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যাপারে কতটুকু প্রয়াসী?

সেলিনা হোসেন : আঙ্গিক একজন কথাশিল্পীর জন্যে খুব জরুরি বলে মনে করি না। বেশি জরুরি হলো তার বিষয়বৈচিত্র্য। তিনি বিষয়টিকে কোথা থেকে উঠিয়ে আনছেন এবং কীভাবে পরিবেশন করছেন- তাঁর ভাষা, উপস্থাপনা- সব কিছুর ভেতর দিয়ে পরিবেশনাটি কতখানি গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছে সেটাই প্রধান বিবেচ্য বলে মনে করি। বিষয় বাদ দিয়ে শুধু আঙ্গিকের ব্যবহার শিল্পকে মহিমান্বিত করে না। একজন লেখকের বিভিন্ন উপন্যাসের পটভূমি ও থিম যদি একইরকম হয়ে যায় তাহলে সেটা একঘেয়ে হয়ে উঠতে পারে। আবার পটভূমি ও থিম একই রেখে প্রকরণ বদল করার জন্য নানা ভঙ্গি ও উপরিকাঠামোর ভেতর যদি নানাকিছু আরোপ করা হয় তাহলে সেটা বড়মাপের কাজ হবে বলে আমি মনে করি না।

২০০০ : কথাসাহিত্যে উত্তরাধুনিকতা এবং যাদুবাস্তবতা বিষয় নিয়ে কিছু বলবেন?

সেলিনা হোসেন : আমি যেটুকু বুঝি তাতে বলতে পারি যে যাদুবাস্তবতা একেকটি ভিন্ন দেশের ভিন্ন সাংস্কৃতিক পটভূমিতে অবস্থান করে। ল্যাটিন আমেরিকার সাহিত্যিকরা যখন এ বিষয়টিকে তাদের সাংস্কৃতিক পটভূমি থেকে তুলে এনে কথাসাহিত্যে স্থান দিলো তখন চমক সৃষ্টি হলো। ইংরেজি ভাষার কারণে তারা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছুতে পারলো। যাদুবাস্তবতা বলতে যদি আমরা এমন কিছু বুঝি যেখানে আমাদের জীবনের নানা অনুষঙ্গকে যদি আমরা তেমন করে তুলে আনতে পারি, ভিন্ন একটা আঙ্গিক যদি তৈরি হয় তাহলে সেটা আর ল্যাটিন আমেরিকায় সীমাবদ্ধ থাকবে না, আমাদের দেশের পটভূমির পরিপ্রেক্ষিতে একটা ভিন্ন আঙ্গিক হয়ে দাঁড়াবে। আর উত্তরাধুনিক সাহিত্য বলতে কী বোঝায় সেটা আমি বুঝি না। ওই শব্দটির প্রতি আমার কোনো আগ্রহ নেই।

২০০০ : আপনি নিজে আঙ্গিক প্রকরণ, ভঙ্গি-ইত্যাদি টেকনিক্যাল বিষয়ে কতখানি মনোযোগ দেন? নাকি নির্দিষ্ট বিষয়কে সামনে নিয়ে এসে উপন্যাস দাঁড় করাতে চান?

সেলিনা হোসেন : আমি বিষয়টির ওপরেই জোর দিই বেশি, আমার কাছে এটা অবশ্যই প্রধান ব্যাপার। বিষয়টিকে প্রধান করে সেই বিষয় অনুযায়ী উপস্থাপনের ভঙ্গিটা বের করতে হবে। ‘ঘুমকাতুরে ঈশ্বর’ উপন্যাসটি সম্পর্কে কেউ কেউ বলেছেন যে, আমি মনস্তত্ত্বের বিস্তৃত আলোচনা করিনি। উপন্যাসের পটভূমি হচ্ছে চর-জীবন। আমি দেখেছি একটি পরিবারকে ষোলবার ষোলটি চরে গিয়ে বাঁচতে হয়েছে। সেখানে আঙ্গিকটির ক্ষেত্রে আমি ছাড় দিয়েছি। অনেক প্রশ্নের উত্তর আমি দিইনি, কারণ অনেক প্রশ্নের উত্তর সেই জীবনে নেই। চরের মানুষ শহরে এসে হারিয়ে যায় জনস্রোতে, এক সময় মরেও যায়। চরে তার স্বজন জানতেও পারে না সে কোথায় আছে। চরের জীবনের ছোট ছোট সন্ধিক্ষণকে আমি উপন্যাসটির বিষয় করেছি এবং সেভাবে উপস্থাপন করেছি। ‘গায়ত্রী সন্ধ্যা’ উপন্যাসে ভাষা আন্দোলনে অহিউল্লাহ নামের একটি কিশোর শহীদের চরিত্র রেখেছি যে আমার নায়কের স্বপ্নে, বাস্তবে নানাভাবে ফিরে ফিরে আসে। যখন কোনো সংকট এসে উপস্থিত হয় তখন নায়ক সেই কিশোরকে দেখতে পায়। সেই কিশোরের উপস্থিতি মানে সামনে কোনো লড়াই আছে। এটাকে আমি প্রতীকী অর্থেও ধরতে পারি আবার ফ্যান্টাসি অর্থেও ধরতে পারি। শিল্পের বলয়ের ভেতরে ওই চরিত্রটিকে আনা আমি জরুরি মনে করেছি।

২০০০ : আচ্ছা আপনার সাহিত্য সৃষ্টিতে ব্যক্তিগত প্রেরণা বা অনুপ্রেরণার ভূমিকা আছে?

সেলিনা হোসেন : আমার ক্ষেত্রে নাই। আমি শুরুতেই বলেছি যে, দুটি কারণে আমি লেখালেখিতে এসেছি। শৈশবে প্রকৃতি দর্শন এবং মানব-মানবীর বিচিত্র সম্পর্ক অবলোকন। আমি যেখানে বাস করেছি শৈশব-কৈশোরে সেখানে বইয়ের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল না। বই পড়ে আমি কিছু আয়ত্ত করিনি।

২০০০ : নারী হওয়ার কারণে একজন লেখক হিসেবে আপনি কোনো সুবিধা পেয়েছেন কিনা কিংবা অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন কিনা?

সেলিনা হোসেন : আমি কোনো সুবিধা পাইনি বা কোনো অসুবিধাও হয়নি। অবাধ স্বাধীনতা পেয়েছি চলার, তাতে কোনো প্রতিরোধের সামনে দাঁড়াইনি। তরুণ বয়সে টেকনাফে গেছি ট্রলারে চড়ে জেলেদের মাছধরা দেখতে। ভেবেছিলাম টুপি পরিহিত দাড়িঅলা মাঝির কাছ থেকে বাধা পাবো, কিন্তু পাইনি। তিনি আগ্রহ নিয়েই আমাকে নিয়ে গেছেন মধ্যসমুদ্রে। ছোটবেলা থেকেই যখন যেখানে খুশি আমি যেতে পেরেছি। তবে একটি বিশ্লেষণ আছে আমার। আমি অত্যন্ত রুগ্‌ণ ছিলাম, শারীরিক গড়নও দীর্ঘ নয়। হয়তো এ কারণেই অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিনি। একজন মেয়ে বড় হয়ে ওঠার পর মানুষের দৃষ্টি তার ওপরে যেভাবে পড়ে আমার ওপরে সে রকম পড়েনি গ্রামে থেকেও। বলতে পারেন এটাই আমার বাড়তি সুবিধা ছিল। মস্তিষ্কের দিক দিয়ে আমি অগ্রসর হচ্ছি, বুঝতে পারছি নর-নারীর সম্পর্কের জটিলতা, আমার বুদ্ধি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে- কেউ আমাকে ডিস্টার্ব করার চেষ্টা করেনি। দ্বিতীয়ত আমি যখনই যেখানে গেছি সেখানে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ গড়ে তোলার চেষ্টা করেছি, যাতে করে কোনো বিরুদ্ধ পরিবেশের মুখোমুখি না হতে হয়। ‘কাঁটাতারে প্রজাপতি’ লিখবার জন্যে সাঁওতাল পরগনায় গেলাম। রামচন্দ্রপুরহাট, ভোলাহাট, কানসাট, শিবগঞ্জ- ওই এলাকার ঘুরেছি। কেউ কিছু বলেনি, কোনো সমস্যা হয়নি। একইভাবে পটুয়াখালী ও টেকনাফে যখন গেছি তখনও কোনো প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হইনি। তার অর্থ আমি সচেতন ছিলাম আমার কাজ উদ্ধারের ব্যাপারে, সতর্ক ছিলাম যেন প্রতিকূল পরিস্থিতির ভেতরে পড়তে না হয়। সেভাবে আচরণ করেছি, কাপড়- চোপড় পরেছি।

২০০০ : নারী ও পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি এবং অভিজ্ঞতায় কিছুটা পার্থক্য তো আমরা লক্ষই করি। লেখককে নারী-পুরুষ উভয় দিকই বিবেচনা করতে হয়, সমগ্রতাকে ধারণ করতে হয়। একজন নারী এবং লেখক হিসেবে আপনার অভিজ্ঞতা কি রকম?

সেলিনা হোসেন : আমি নারী ও পুরুষ- দুটো অভিজ্ঞতাই নিজের ভেতর গ্রহণ করতে পেরেছি। ‘মগ্ন চৈতন্যে শিস’ উপন্যাসটি বেরিয়েছিল সাতাত্তরে ঈদসংখ্যা পূর্বাণী পত্রিকায়। সে সময় একজন পাঠক চিঠিতে লিখেছিলেন, আপনি কী করে পুরুষের

‘তবে একটি বিশ্লেষণ আছে আমার। আমি অত্যন্ত রুগ্‌ণ ছিলাম, শারীরিক গড়নও দীর্ঘ নয়। হয়তো এ কারণেই অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিনি। একজন মেয়ে বড় হয়ে ওঠার পর মানুষের দৃষ্টি তার ওপরে যেভাবে পড়ে আমার ওপরে সে রকম পড়েনি গ্রামে থেকেও। বলতে পারেন এটাই আমার বাড়তি সুবিধা ছিল’

সিগারেট খাওয়ার অনুপুঙ্খ বর্ণনা দিতে পারলেন? আমি একজন পুরুষের সিগারেট খাওয়ার ভঙ্গি, সে সময়ের ভাবনা ইত্যাদি নিজের মতো করেই লিখেছিলাম। একজন পুরুষ সেটি পড়ে বুঝতে পারছেন যে, তার অভিজ্ঞতার সঙ্গে সেই বর্ণনা মিলে যাচ্ছে। আমি মনে করি, এটাই লেখকের কাজ। আবার নারীর সন্তান প্রসবের বর্ণনা যখন দিচ্ছি 'গায়ত্রী সন্ধ্যা'য় তখন আমি নিজের অভিজ্ঞতাটাই কাজে লাগাচ্ছি। নারী-পুরুষ উভয়কে সমন্বয় করা ঔপন্যাসিকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

২০০০ : আপনি যখন আপনার উপন্যাসগুলোর দিকে ফিরে তাকান তখন আপনার মনে হয় কিনা যে এসবের ভেতর নারীর কথা, নারীর জগৎ, নারীর উপলব্ধিই বহুলভাবে প্রকাশিত?

সেলিনা হোসেন : না, এরকম কখনো মনে হয়নি। কারণ আমি সেভাবে লিখিওনি। আমি নিজেকে সে রকম বড় মাপের নারীবাদী মনেও করি না। যদিও নারীরা পুরুষতন্ত্রের শিকার, তারপরও বলবো জনজীবনের দিকে যখন তাকাই দেখতে পাই শ্রেণী দুটি এমনভাবে বিভক্ত যে সাধারণ মানুষের জীবনকথা তুলে ধরার জন্য নারী-পুরুষকে সম্মিলিতভাবে উপস্থাপন করা প্রয়োজন।

২০০০ : 'নারীবাদী সাহিত্য' বলে একটা টার্ম ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে এ বিষয়ে আপনার মূল্যায়ন ও পর্যবেক্ষণ সংক্ষিপ্তভাবে জানতে চাই।

সেলিনা হোসেন : আমি মনে করি 'নারীবাদী সাহিত্য' বলে যে টার্মটি আছে সেটি আমাদের দেশে সেভাবে তৈরি হয়নি। আমার যাঁরা অগ্রজ লেখক- রাজিয়া খান, দিলারা হাশেম, রাবেয়া খাতুন, রিজিয়া রহমান- এঁদের উল্লেখযোগ্য রচনাই কিন্তু নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লেখা হয়নি। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে এই চেতনা খানিকটা আছে, তবে সেটা এখনও প্রবল হয়ে ওঠেনি। বিদেশে যেটা খুবই প্রবল।

২০০০ : আপনি কেন শুধু নারীদের কথা বলছেন? নারীবাদী সাহিত্য তো পুরুষরাও রচনা করতে পারেন।

সেলিনা হোসেন : হ্যাঁ, পারেন। কেন পারবেন না? আবু ইসহাকের 'সূর্যদীঘল বাড়ী', কিংবা শওকত ওসমানের 'জননী' উপন্যাস নারীপ্রধান হলেও এগুলোকে নারীবাদী সাহিত্য বলা যাবে না। নারীবাদী সাহিত্য সৃষ্টির জন্যে আরো বড় ও ভিন্ন পার্সপেক্টিভ আনতে হবে যা গভীর তত্ত্বের কথা। সেখানে পুরুষতন্ত্র কিভাবে নারীকে বঞ্চিত ও শাসিত করছে সেই আখ্যান আসতে হবে। নারী কীভাবে পুরুষতন্ত্র আত্মস্থ করে সেটাও থাকতে হবে। নারীর নিজস্ব জগত নারীকেই জানতে হবে।

> **'আমার এমনও মনে হয়েছে যে, মার্কেজের উপন্যাসটিকে অনুসরণ করে এখানকার চরিত্রের সমন্বয়ে একটি ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার্স অব সলিচিউড বা 'শতবর্ষের নীরবতা' উপন্যাস লিখি। নামটাও একই থাকবে। সত্যি সত্যি আমি এ রকম ভাবছি'**

২০০০ : লাতিন আমেরিকা এবং আফ্রিকার সাহিত্য আজ মহত্ব ও শক্তিমত্তার বিচারে আলোচিত। বহির্বিশ্বের কথাসাহিত্য আত্মস্থ করে বাংলা কথাসাহিত্য ভুবনকে সমৃদ্ধ করার প্রয়োজন আছে কি? অন্ধ অনুসরণের জন্য নয়, ঋণ করার জন্য নয়, অন্তত আমাদের পরিপ্রেক্ষিতে জীবনঘনিষ্ঠ সৎ সাহিত্যের প্রয়োজন?

সেলিনা হোসেন : হ্যাঁ, দরকার আছে। তাতে আমাদের সাহিত্য সমৃদ্ধই হবে। আমি যখন বান্দরবানের থানচিতে যাই তখন আমার মনে হয় এখানেও মার্কেজের সেই বিখ্যাত উপন্যাস 'ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার্স অব সলিচিউড'-এর পটভূমি রয়েছে। আমার এমনও মনে হয়েছে যে, মার্কেজের উপন্যাসটিকে অনুসরণ করে এখানকার চরিত্রের সমন্বয়ে একটি ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার্স অব সলিচিউড বা 'শতবর্ষের নীরবতা' উপন্যাস লিখি। নামটাও একই থাকবে। সত্যি সত্যি আমি এ রকম ভাবছি। সিরিয়াসলি ভাবছি। হুবহু মার্কেজের চরিত্রগুলোও থাকবে এতে, কিন্তু আমাদের পটভূমিতে।

২০০০ : আপনি কিশোরদের জন্য লিখছেন। একই সঙ্গে শিক্ষামূলক এবং আনন্দদায়ক শিশু-কিশোর গল্প-উপন্যাস খুব কমই লেখা হয়। আপনি কি আমার মন্তব্যের সঙ্গে একমত পোষণ করেন?

সেলিনা হোসেন : শিক্ষামূলক এবং আনন্দদায়ক- একই সঙ্গে করা খুবই কঠিন কাজ।

২০০০ : আপনি তো করেছেন। 'মেয়রের গাড়ি'র কথা বলতে পারি।

সেলিনা হোসেন : চেষ্টা করেছি। 'মিহিরুণের বন্ধুরা' উপন্যাসেও সেই চেষ্টা ছিল।

২০০০ : আপনি বেশ ভাগ্যবান। আপনার বেশ কিছু লেখা ইংরেজি ছাড়াও কয়েকটি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। কেমন লাগে আপনার?

সেলিনা হোসেন : আপনি ভাগ্যবান বললেন কেন?

২০০০ : খুব কম লেখকের লেখাই অনূদিত হয়েছে। শওকত ওসমানের মতো লেখকের জননী উপন্যাসটির অনুবাদ হলো তাঁর জীবনসায়াহ্নে এসে।

সেলিনা হোসেন : আসলে কিছু সুযোগ তৈরি হতে হয়। সেই সুযোগটা আমার ক্ষেত্রে তৈরি হয়েছে, এটাকে ভাগ্য বলে মানার কোনো কারণ নেই। মালায়লাম ভাষার লেখক এমটি বাসুদেব নায়ার, যিনি তাঁর ভাষার খুব নামী লেখক, জ্ঞানপীঠ ও সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পেয়েছেন, তিনি দিল্লি সার্ক রাইটার্স ফোরামে আমার পঠিত পেপারটিকে খুব পছন্দ করেছিলেন। তিনি কেরালার সাহিত্য উৎসবে আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন। উপন্যাস অনুবাদ করার ব্যবস্থা করলেন। এটা কি শুধুই ভাগ্য? লাহোর থেকে চিঠি এলো আমার লেখা উর্দুতে অনুবাদ করার অনুমতি চেয়ে। এক্ষেত্রে কোনো যোগাযোগই ছিল না। লেখা অনূদিত হলে অন্য ভাষায়ও পাঠক সৃষ্টি হয়। অমর্ত্য সেনের কন্যা অন্তরা দেব সেন 'দ্য লিটল ম্যাগাজিন' নামে চমৎকার একটি পত্রিকা করে। ওর সঙ্গে কাঠমন্ডুতে আলাপ। অন্তরা তার কাগজের জন্য অনুবাদ গল্প চাইলো। আমি দেশে ফিরে পাঠিয়ে দিলাম। তিনটা গল্প ছাপা হলো। আমি বুঝতে পারলাম যে আমার পাঠক বেড়ে গেছে। জার্মানি থেকে দাউদ হায়দার চিঠিতে জানালো যে, ওর মেলবক্স থেকে এক জার্মান মহিলা পত্রিকাটা নিয়ে আমার গল্প পড়ে আমার সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন ওর কাছে।

২০০০ : সম্প্রতি আপনি অবসর নিয়েছেন বাংলা একাডেমী থেকে, যেখানে প্রায় সারাটা জীবনই কাটিয়েছেন।

সেলিনা হোসেন : ৩৪ বছর চাকরি করলাম।

২০০০ : সুদীর্ঘ সময়। আপনার কর্মস্থল বাংলা একাডেমী লেখক সেলিনা হোসেনের সহায়ক হয়েছে কতটুকু?

সেলিনা হোসেন : দুইভাবে সহায়ক হয়েছে। প্রথমত, গবেষণা ও প্রকাশনা- এ দুটি কাজের ভেতর থেকে লেখক হিসেবে আমি উপকৃত হয়েছি। বিশাল লাইব্রেরিতে পড়ার সুযোগ পেয়েছি অঢেল, পত্রিকা

সম্পাদনার সুযোগ পেয়েছি। অভিধানের কাজের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরেছি। বাংলা একাডেমীর উল্লেখযোগ্য কাজের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পেরেছি। এতে প্রচুর অভিজ্ঞতা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, দেশের বাইরে পরিচিতির পেছনে বাংলা একাডেমীর একটি ভূমিকা আছে। বাইরের সভা-সেমিনার, উৎসবে যোগ দিয়ে দেখেছি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা উজ্জ্বল প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলা একাডেমীকে বিবেচনা করে। সেখানে কর্মরত একজন লেখককে গুরুত্ব দিয়েছেন। আমার লেখক পরিচিতির পেছনে এই প্রতিষ্ঠানের অবশ্যই একটি অপ্রত্যক্ষ ভূমিকা আছে। বাংলা একাডেমীতে কাজের পরিবেশ অনুকূল ছিল। হাতে কাজ না থাকলে বসে বসে আমি বই পড়তাম। কিংবা নিজের লেখার প্রুফ দেখতাম। অনেক সময় লেখা তৈরিও করেছি। অন্য অফিসে কাজ করলে এটা সম্ভব হতো বলে মনে হয় না। এই প্রতিষ্ঠান ছেড়ে কোথাও যাবার কথা ভাবিনি কখনো। সত্তরে আমি যোগ দিয়েছিলাম বাংলা একাডেমীতে। কলেজে অধ্যাপনার তুলনায় এখানে বেতন ছিলো প্রায় অর্ধেক, তবু বাংলা একাডেমীকেই কর্মস্থল হিসেবে নির্বাচন করেছিলাম।

> **‘বাংলা একাডেমীর গবেষণার ক্ষেত্রটি আমাকে খুবই কষ্ট দেয়। এখনো পর্যন্ত এই ক্ষেত্রটি এমন একটি পর্যায়ে উন্নীত হতে পারলো না যেটা নিয়ে আমরা গর্ব করতে পারি। আমাদের গবেষণা করার এমন কিছু বিষয় আছে যেগুলো বাংলা একাডেমীরই কাজ, যেমন বড় আকারের পরিভাষাকোষ নেই আমাদের’**

২০০০ : এখন আপনি আর বাংলা একাডেমীর ভেতরে নেই। এখন হয়তো দূর থেকে আপনি বাংলা একাডেমীকে দেখতে পারেন, নিরপেক্ষভাবে প্রতিষ্ঠানটির কাজের মূল্যায়ন করতে পারেন। বাংলা একাডেমীর কোন দিকটি আপনাকে পীড়া দেয়?

সেলিনা হোসেন : বাংলা একাডেমীর গবেষণার ক্ষেত্রটি আমাকে খুবই কষ্ট দেয়। এখনো পর্যন্ত এই ক্ষেত্রটি এমন একটি পর্যায়ে উন্নীত হতে পারলো না যেটা নিয়ে আমরা গর্ব করতে পারি। আমাদের গবেষণা করার এমন কিছু বিষয় আছে যেগুলো বাংলা একাডেমীরই কাজ, যেমন বড় আকারের পরিভাষাকোষ নেই আমাদের। ভাষা আন্দোলনের ৫০ বছর পূর্তি হলো অথচ আদিবাসীদের ভাষা নিয়ে কোনো বড় কাজ করেনি এই প্রতিষ্ঠান। ওরা তো এ দেশেরই নাগরিক। আমাদের সাহিত্যকোষ নেই। বিজ্ঞানকোষ হতে অনেক সময় লেগেছে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংলকন করতে পারেনি। প্রকল্পের মাধ্যমে অনেক কাজ করা উচিত ছিল। সুষ্ঠু পরিকল্পনা করে বাংলা একাডেমী কাজ করেনি। সৃজনশীল সাহিত্য নিয়েও কিছু কাজ করা যেতো।

২০০০ : আপনার মেয়ে লারা বিমান চালানোর সময়ে দুর্ঘটনায় মারা যান। তাকে নিয়ে একটি হৃদয়স্পর্শী উপন্যাস লিখেছেন ‘লারা’ নামেই।

সেলিনা হোসেন : লারাকে হারানোর কষ্টটাই প্রধান। আমার মনে হয়েছিল এই উপন্যাসের ভেতর দিয়ে আমি তাকে ফিরিয়ে আনছি।

২০০০ : ‘লারা’ উপন্যাসে অবশ্য লারাই প্রধান। কিন্তু উড়ন্ত বিমানে তার পাশেই সহচালকের আসনে যে যুবকটি বসে ছিলো সে-ও লারারই মতো দুঃখজনক পরিণতি বরণ করেছিলো। অথচ আপনার উপন্যাসে তাকে প্রায় খুঁজেই পাওয়া যায় না।

সেলিনা হোসেন : আমি তো তাকে আনিইনি। আপনি ভুল বুঝছেন। এটাকে আমি উপন্যাস হিসেবেই দেখেছি, দুর্ঘটনা হিসেবে নয়। লারার সঙ্গেই যে ছেলেটি মারা গিয়েছিল তার সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। তার কোনো কিছুই আমার অভিজ্ঞতার ভেতরে নেই। মৃত্যুর পর তার মায়ের কাছে গিয়ে তার সম্পর্কে জানবো, বিষয়টি খুব রূঢ় মনে হয়েছে আমার কাছে। তাছাড়া এটি তো ঘটনাভিত্তিক উপন্যাস নয়। আপনি ভুলে যান আমি সেলিনা হোসেন এবং লারা আমার মেয়ে। আমি দেখাতে চেয়েছি মা ও মেয়ে কীভাবে এগোয় এবং একটি উপন্যাস তৈরি করতে পারে। লারার সঙ্গে কে মারা গেল সেই বিষয়টি লেখার সময় জরুরি মনে হয়নি। আমি লেখক হিসেবেই উপন্যাসটি লিখেছি, লারার মা হিসেবে নয়।

২০০০ : ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব ও উপাদান নিয়ে আপনি যেসব উপন্যাস লিখেছেন যেমন ভালোবাসা প্রীতিলতা, কালকেতু ও ফুল্লরা- তাতে মনে হচ্ছে নারীর বিষয়টিই প্রাধান্য পেয়েছে?

সেলিনা হোসেন : কেন, আমি তো মুনীর চৌধুরী, সোমেন চন্দকে নিয়েও লিখেছি। আর কালকেতু ও ফুল্লরায় স্বৈরশাসক এবং তার স্ত্রী- দুটো চরিত্রই প্রধান। আমি মানুষ হিসেবে, জনগোষ্ঠী হিসেবে বিষয়টিকে প্রথমে দেখতে চাই। তারপর নারীর অবস্থান, জেন্ডার বৈষম্য এসব আসে।

২০০০ : আপনার ভেতরে অতৃপ্তি কাজ করে না?

সেলিনা হোসেন : অবশ্যই করে। লিখতে লিখতে মনে হয় এই লেখার স্থান হবে আঁস্তাকুড়ে। তাই অনেক লিখতে চাই, অনেক লেখার তাড়া বোধ করি। মনে হয় এটা হলো না, এটায় পারলাম না; আরেকটায় হবে, আরেকটায় পারবো।

২০০০ : বিগত পনের-কুড়ি বছরে যেসব নতুন লেখক এসেছেন কথাসাহিত্য অঙ্গনে, তাঁদের লেখা কি আপনি পড়েন? আপনার মন্তব্য জানতে চাই।

সেলিনা হোসেন : হ্যাঁ আমি পড়ি। আমার মনে হয়েছে বিভিন্ন বিষয় তাঁরা নিজের আঙ্গিকে তুলে আনার চেষ্টা করছেন। এটাই আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়।

২০০০ : কবি ও কথাশিল্পী- সৃজনশীল দুটো মাধ্যমে কাজ করেন, অথচ একপক্ষ অন্য পক্ষের লেখার প্রতি বিশেষ আগ্রহী নন; আলোচনা মূল্যায়ন করেন না। আপনার কী মনে হয়?

সেলিনা হোসেন : হ্যাঁ, প্রবণতাটা সে রকমই মনে হচ্ছে। উভয়েরই উভয়পক্ষের লেখা পাঠ করা উচিত; পরস্পরকে না জানলে তো ক্ষেত্রটা আবিষ্কৃত হবে না। আমার মনে হয়, কথাসাহিত্যিকরা কবিতা ঠিকই পড়েন, কবিরাই বরং কথাসাহিত্য পাঠ করেন না, ভলিউমের কারণেও এটা হতে পারে। ফলে আমাদের কবিরা কথাসাহিত্যিকদের ঠিকমতো বুঝতে পারেন না।

২০০০ : আমাদের অনেক নারী লেখক সংসারে প্রবেশ করে, মা হয়ে যাবার পর আরো বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়ার কারণে ধীরে ধীরে লেখালেখি থেকে দূরে চলে যান বা যেতে বাধ্য হন। আপনিও তো সংসারজীবী এবং মা...

সেলিনা হোসেন : আমার জীবন একদিকে, লেখালেখি আরেক দিকে; আমার এক হাতে ব্যক্তিগত জীবন, আরেক হাতে লেখালেখি। লেখালেখির চর্চাকে আমি এভাবেই নিষ্ঠার সঙ্গে ধরে রাখতে চাই। ফাঁকি দিয়ে বাজিমাৎ করার অপপ্রয়াস করেছি বলে মনে হয় না। যে শিল্পমাধ্যম আঁকড়ে ধরেছি তার প্রতি সৎ থাকার চেষ্টা করেছি।

ছবি : আনোয়ার মজুমদার